দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার প্রেক্ষাপট

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত জটিল ও বিক্ষুব্ধ যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। নানা বিরোধী ভাবের তরঙ্গ নানাপথে এসে এই যুগটিকে আবর্ত-সংকুল করে তুলেছিল। একদিকে যেমন বিদেশী শিক্ষার প্রভাব ছিল প্রবল, অন্যদিকে তেমনি বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে প্রাচীন আদর্শকে রক্ষা করবার আগ্রহও ছিল অপরিসীম। এক কথায় এই শতাব্দীর বাঙালীর ভাবজগতের ভারসাম্য বিভিন্ন অপরিচিত ও অভাবিত তরঙ্গে বিচলিত হয়েছিল, কোনো সুস্পষ্ট আদর্শে অবিচল থাকতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চলছিল 'নিত্য নব নব পরীক্ষা' ও 'প্রচলিত ধারা বর্জন'। কখনো সৃষ্টি হচ্ছিল অশ্লীল কাব্য, কখনো ব্যঙ্গকাব্য কখনো বা মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, আবার কখনো বা প্রহসন, নক্শা, উপন্যাস ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন কাব্য রচনা শুরু করেন (ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষপাদে) তখন বাংলাকাব্য ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এসে গীতিকবিতায় পরিণত হয়েছে। অব্যবহিত পূর্বের কবি বিহারীলালের (১৮৩৫-১৮৯৪) ভাবময়তা (রোমান্টিকতা) সেসময়কার কবি ও সাহিত্যিকরা প্রধানত অনুসরণ করে চলছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যে এই রোমান্টিক-তারই সার্থক ও সূক্ষ্ম প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০ - ১৯২৬), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০ - ১৮৯৮), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬ - ১৮৯৭), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩ - ১৯৪০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০ - ১৯১৯) প্রমুখ দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক বর্ষীয়ান-বর্ষীয়সী কবি ও সেই সংবেদনশীল রোমান্টিক কল্পনার প্রভাবে ছিলেন আচ্ছন্ন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বিহারীলালের রোমান্টিকতা, ভাবের আবিষ্টতা গ্রহণ করলেন না। আত্মমগ্ন ভাব-বিহ্বলতাকে যদি গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণ বলে স্বীকার করা

যায় তবে দ্বিজেন্দ্রের কবিতা অন্যতর শ্রেণীতে পড়বে। নিছক ভাবের কবিতা তিনি লেখেননি। বস্তুব্যের স্বচ্ছতাই তাঁর কাম্য ছিল, কাব্যপ্রবাহের উদ্ভবপর্বের কবিতায় রোমান্টিক কবিদৃষ্টি, সৌন্দর্যমুগ্ধ মন ও অকৃত্রিম গীতিউচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও। অন্যভাবে বলা যায় - আর্য্যগাথা (১ম ভাগ)র 'বিষাদোচ্ছ্বাস'-এর মধ্যে যে ভাবাতিরেক আছে তা অর্ধব্যক্ত এবং অনতিস্ফুট হলেও বিহারীলালের আত্মবিহ্বলতা তাতে নেই। দ্বিজেন্দ্র অন্তরের বেদনাময় ভাবনা ও বিষন্নতাই প্রকৃতির দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। নবজাগরণের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ কবি তাঁর রচনায় একটি সর্বজনবোধ্য কাহিনীর আয়োজন করেও কখনো ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে, কখনো বা সরাসরিই স্বদেশের প্রতি মমতাকে প্রকাশ করে জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

এই জাতীয়তাবোধের সুর অবশ্য ঈশ্বরগুপ্তের আমল থেকেই বাংলা কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে। কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক সংগঠন যজ্ঞের শুরু হয়েছিল, বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছিল, তখন এমন কোনো ভাবের মূল্য ছিল না, যা নির্জন, অস্ফুট এবং ব্যক্তিগত। সর্বজনবোধ্য আদর্শ ও ভাবকে পরিবেশন করাই সেসময়কার কবি ও সাহিত্যিকদের কাম্য ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত তাই তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে বিভ্রান্ত বঙ্গ সন্তানদের অনাচার প্রিয়তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপে করে সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের সূচনা করেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার অপ্রতুলতার জন্যে তিনি উল্লেখযোগ্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। পরবর্তী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ফলে ইংরেজি ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্যের আদর্শে রাজপুত দেশপ্রেমের ঘটনা অবলম্বনে স্বদেশপ্রেমমিশ্রিত বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যে মহাকাব্যের বীজ বপন করলেন। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে ঘটল পালাবদল। টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' -এ আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমন ও জহরব্রতে আগুন জ্বালিয়ে পদ্মিনীর আত্মাহুতিদানের যে বর্ণনা আছে তার ওপর ভিত্তি করেই তিনি রচনা করলেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান'(১৮৫৮)। এছাড়া তাঁর 'শূরসুন্দরী'(১৮৬৮),

'কর্মদেবী'(১৮৬২), 'কাঞ্চীকাবেরী'(১৮৭১) প্রভৃতিও রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রঙ্গলালের এই কাব্যগুলি মহাকাব্যের ধারে কাছে যেতে পারেনি। ছন্দ গতানুগতিক, (পয়ার, ত্রিপদী, মানঝাঁপ), ভাষা লঘু ধরণের, কেবল মুঘল আক্রমণে হিন্দুর উত্থানের আকাংক্ষাকে পাশ্চাত্য আদর্শে অনেকটা আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় ব্যবহার করে দেশপ্রেমকে সুস্পষ্ট করেছিলেন মাত্র।

রঙ্গলাল আধুনিকতা বলতে বুঝেছিলেন শুধু বিষয় পরিবর্তন। অভিনব বিষয়-উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গিমা তখনও পর্যন্ত গঠিত হয়নি। তাঁর প্রায় সমসাময়িক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩) প্রথম বিষয়ের অতিরিক্ত ভাবপ্রকাশের (দেশীয় কাহিনীর মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের পরিচয় দেবার) পদ্ধতিতে, ছন্দ এবং ভাষারীতিতেও নূতনত্ব এনেছিলেন - দেশী, বিদেশী রীতির সংমিশ্রণে মিলটনের Blank Verse - এর অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের ভিতর দিয়ে। বিদেশী সাহিত্যের নেশা তাঁর কাব্যরচনার শুরু থেকেই ছিল প্রবল। প্রথম যৌবনে 'A Vision', 'Captive Ladie' - প্রভৃতি কতগুলি ছোটবড় ইংরেজি কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেনি। বিদেশী ভাব ও পদ্ধতিকে আত্মসাৎ করে, মাতৃভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য রচনা করেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন যদিও তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব'(১৮৬০) এদিক থেকে খুব একটা সার্থক হতে পারেনি। মহাকাব্যের বিস্তৃতি থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে গীতিকবিতার ঝংকার শুনতে পাওয়া যায় এতে। পুরাণের সুন্দ-উপসুন্দ কাহিনীটিকে ঘিরে মধুসূদন যে কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্য দেখিয়েছেন, তাতে সংহতির চাইতে অসংযত উচ্ছ্বাসই বেশী। যেমন চতুর্থসর্গ, যেখানে তিলোত্তমার অভিসার বর্ণিত হয়েছে মাত্র কয়েক ছত্রে। সরোবরের জলে নিজের রূপের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ তিলোত্তমার হঠাৎ করে কিশোরী থেকে তরুণী বিজয়িনীতে বিকাশের যে বর্ণনা করেছেন মধুসূদন, সেখানে পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবি কীট্সের সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াসই অনুভূত হয়। গীতিকবির ভাবাবেগের আতিশয্য, উচ্ছ্বাসও সেখানে সুস্পষ্ট।

সার্থক মহাকাব্যের সুর শুনতে পাওয়া যায় মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্য 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১)এ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের যথার্থ প্রয়োগে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য এতে যথোপযুক্তভাবে বিধৃত। তাছাড়া, নয়সর্গে সম্পূর্ণ এ কাব্যে বীরবাহুর নিধনসংবাদ থেকে শুরু করে মেঘনাদের হত্যা এবং প্রমীলার স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ পর্যন্ত মোট তিনদিন ও দু'রাতের ঘটনা আছে। এদিক থেকেও কাব্যটি মহাকাব্যের বিশালতা লাভ করতে পেরেছে। মূল রামায়ণ থেকে এর কাহিনী সংগৃহীত হলেও মধুসূদন একাব্য রচনায় বাল্মীকির আদর্শকে বর্জন করে পাশ্চাত্য কবিদের (হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন প্রমুখ) দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বেশী। যেমন দ্বিতীয় সর্গে উমার প্রসাধন এবং শিবকে ভুলিয়ে তাঁকে রাবণের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার যে ঘটনা, তা ঘটেছে হোমারের 'ইলিয়াডে'র চতুর্দশ সর্গের জিউসের প্রতি হেরার প্রচেষ্টার অনুকরণে। আবার হোমারের দেবী থেটিস যেমন দেবশিল্পী হেফাইসটোসকে দিয়ে দিব্য অস্ত্র গড়িয়ে পুত্র অখিলেওসের কাছে পাঠালেন হেকটর বধের জন্য, মেঘনাদবধ কাব্যেও তেমনি ইন্দ্র মহামায়ার কাছ থেকে দিব্য অস্ত্র নিয়ে দেবদূত গন্ধর্ব চিত্ররথকে দিয়ে লক্ষ্মণের কাছে পাঠিয়েছেন ইন্দ্রজিৎ-বধ উদ্দেশ্যে।

মেঘনাদ যে নিরস্ত্র অবস্থায় কোনো দেবতাকে স্মরণ করে উত্তেজিত হয়ে লক্ষ্মণকে আঘাত করেননি, সেই আত্মনির্ভরশীলতা হোমারিক বীরত্বেরই বিশেষ লক্ষণ।

গ্রীক সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ দৈবনির্বন্ধবাদ। ওডিসিতে এথেনার উক্তি -

"Death is certain and when a man's fate(moira)has come, not even the gods can save him, no matter how they love him. [moira was a daimon of doom and death]".[১]

এই অন্ধ নিয়তি মেঘনাদবধের ঘটনারও নিয়ন্ত্রক। বিভিন্ন চরিত্র, দেবদেবী এবং নায়ক রাবণ স্বয়ং এই নিয়তির হাতে বন্দী। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপোক্তিতে রয়েছে স্পষ্টভাবে নিয়তির উল্লেখ -

"হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?
(নবম সর্গ)

অথবা -

"কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ? "
(প্রথম সর্গ)

এই 'দারুণ বিধি' গ্রীক moira ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাচীনকাল থেকে রাম-রাবণ সম্পর্কে যে ধারণা চলে আসছে, সেই মিথরস ভেঙে তিনি রাম-রাবণকে চিত্রিত করেছিলেন উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালী করে। রাবণের যে লংকা রক্ষার চেষ্টা বা স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা তার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালীর দেশপ্রীতিই অনুরণিত; রূপকের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে এতে যুগের সামগ্রিক উৎকণ্ঠা।

আসলে মধুসূদন রামায়ণকে নূতন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছেন। দেবদানব নির্বিশেষে মানবস্বভাব আরোপ করেছেন তিনি। শুরু করেছেন পুত্রশোকাতুর রাবণের অশ্রু বিসর্জনে, শেষও হয়েছে রাবণের বিলাপ বা হাহাকারে, যার ভেতর দিয়ে মধুসূদনের জীবনবেদনা, সঞ্চিত ব্যর্থ আশার রুদ্ধ রোদনাবেগ, বিশ্ববিধানের প্রতি সার্বভৌম ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সুরই স্পষ্ট শোনা যায়।

যুগের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে রঙ্গলাল, মধুসূদনের ব্যক্তি-চিত্তের নিভৃত চিত্তের মন্ময় আকাংক্ষার উৎসার পথ রুদ্ধ হয়েছিল তখনকার জাতীয় চেতনায়। ফলে মধুসূদনের কবি-মানসের মধ্যে ক্লাসিক আদর্শের সঙ্গে একটি রোমান্টিক ভাবনা আগাগোড়া জড়িত থাকলেও তিনি সরাসরি নিজের কথা বলতে পারেননি। কখনো রাধা, কখনো বীরাঙ্গনাদের ভাবনার বৃন্তে নিজের বাসনাকে রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন। কারণ 'ব্রজাঙ্গনা'(১৮৬১)র রাধার বিরহ

'বৈষ্ণব পদাবলী'র মতো আধ্যাত্মিক পর্যায়ের নয়, মানবিক। এখানকার রাধা কবির চোখে Mrs. Radha । আর ওভিদের Heroides - কাব্যের আদর্শে রচিত 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) কাব্যের নায়িকাদের ভাবনাতেও নেই কোনো আধ্যাত্মিকতার ছাপ, আছে মধুসূদনের পুরনো ঐতিহ্যকে ভেঙে ফেলার আকাংক্ষার ইঙ্গিত। এমনকি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'(১৮৬৬) র অন্তর্ভুক্ত সনেটগুলিও তাঁর আত্মপরিচয়েরই বাহন। যদিও বেশীর ভাগ সনেটই খাঁটি গীতি-কবিতা না হয়ে বিষয়প্রধান খন্ড কবিতা হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত: 'নববর্ষ' কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে - সনেটের নির্দিষ্ট বিধিবিধান ও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে এর সুর গীতো-চ্ছ্বাসে পরিণত হবার সুযোগ না পেলেও তা লক্ষ্য করবার মতো। 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১) এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২, ৪ জুন) কবিতায় আশার ছলনে ভুলে মধুসূদনের জীবন যে ব্যর্থতায় অবসিত হয়েছিল তারই দীর্ঘশ্বাস অনুরণিত হয়েছে।

হেমচন্দ্র (১৮৩৮ - ১৯০৩) নবীনচন্দ্রের (১৮৪৭ - ১৯০৯) মধ্যে সেই নব-জাগরণের যৌথ বিকাশ-প্রত্যাশী তীব্রতা কিছুটা শান্ত হয়ে আসায় তাঁদের ব্যক্তি-চিত্ত মুক্তি-পায়। তবু 'দেশহিত' ও 'বিশ্বহিত'-র প্রবল প্রত্যক্ষ আগ্রহের জন্যে তাঁদের বিশুদ্ধ মন্ময় ভাবুকতার বিস্তার সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। সেজন্য তাঁরা মধুসূদনকে অনুসরণ করে মহাকাব্য রচনারই চেষ্টা করলেন, শেষ পর্যন্ত অবশ্য সার্থক হতে পারেননি। হেমচন্দ্র নিজের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করেছিলেন উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখে, আর নবীনচন্দ্র করেছিলেন পৌরাণিক উপাখ্যানের নবমূল্যায়ন।

বলাবাহুল্য, পুরাণের দেবতাদের বৃত্রসংহারের কাহিনী অবলম্বনে হেমচন্দ্র যে 'বৃত্রসংহার' নামে কাব্যটি লিখেছিলেন, কাহিনীর দৈর্ঘ্য ও বিশালতার দিক থেকে তা মহা-কাব্যের উপযুক্তই হয়েছে। ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে হেমচন্দ্রের তীব্র সচেতনতাও প্রকাশ পেয়েছিল একাব্যে কিন্তু রচনাপদ্ধতিতে এটি অসার্থক। এখানে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা

কেবল মিলহীন পয়ার যাত্র। বৈচিত্রের জন্য নানাধরণের ছন্দ প্রয়োগ করেছেন হেমচন্দ্র, তাতেও মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হয়েছে। বহুবর্ণনা নীরস এবং গদ্যাত্মক। চরিত্রসৃষ্টিতেও মহাকাব্যিক কল্পনার পরিচয় নেই। বৃত্রকে স্ত্রৈণ, স্থূলবুদ্ধি, দানব, ঐন্দ্রিলাকে ঈর্ষাপরায়ণ গ্রাম্য স্ত্রীলোক করেই চিত্রিত করেছেন কবি এ কাব্যে। এদের পরিণতিতেও নেই মানব-ভাগ্যের নিদারুণ ট্র্যাজেডি। জীবনধর্মের চেয়ে মানসধর্মই বড় হয়ে উঠেছে এখানে।

শুধু মননধর্মিতা কেন, 'চিন্তাতরঙ্গিনী'(১৮৬১)র জীবনচিন্তা, 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২)র বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, allegory -র রীতিতে রচিত 'আশা-কানন'(১৮৭৬)-এর রূপক রচনা এবং দান্তের 'Divine Commadia' -র অনুসরণে রচিত ছায়াময়ী'(১৮৭০)- কোনোটিই মহাকবির লক্ষণ নয়। কাল্পনিক ইতিহাসের পটে স্বদেশপ্রেম অবলম্বিত হয়েছে এ সমস্ত রচনায়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' ও 'চিন্তবিকাশ' কাব্যে কিছুটা গীতিকবিসুলভ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কেননা এগুলিতে আছে কবিহৃদয়ের বেদনা মাধুরীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তবে যেহেতু তিনি রোমান্টিক কল্পনার কবি ছিলেন না, সাদাসিধে ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতেন, সেজন্য দূরপ্রসারী চিত্রকল্পরীতি, ভাষা ও ব্যঞ্জনার প্রতীকতার দিক থেকে এগুলি খুব উঁচুদরের হয়নি।

নবীনচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণজীবনকে ভিত্তি করে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সমাজ এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সৃচনা, করেন 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র'(১৮৯৩), 'প্রভাস'(১৮৯৬) নামে ত্রয়ী মহাকাব্যের। কিন্তু সেখানেও মাঝে মাঝে এসে গেছে রোমান্সের অলীক কল্পনা - যুগোচিত হিন্দুত্বের অভিমান, বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি ও উচ্ছ্বাস এবং কৃষ্ণের মধ্যে নারীচিত্তকে আকর্ষণ ও উপেক্ষা করা। এছাড়া আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, নীতি-শাস্ত্র, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি আদর্শ কৃষ্ণজীবনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েও একাব্যের ক্লাসিক

গাম্ভীর্য অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। নারীচরিত্রগুলিও মহাকাব্যোচিত হয়নি, তারা হৃদয়ভারে বিব্রত, আত্মবিশ্লেষণে নিপুণ - এই আত্মবিশ্লেষণ মহাকবির কাজ নয়, আধুনিক আত্মকেন্দ্রিক গীতিকবির পক্ষেই সম্ভব। বিশেষতঃ 'ত্রয়ী'র কিছু কিছু ভাষাভঙ্গি, কিছু কিছু পুংখানুপুংখ বর্ণনাও হয়েছে গীতিকাব্যোচিত।

"আমি কে, কার কি ধর্মপত্নী দুর্বাসার,
নাকি স্বপ্নরাজ্যে আমি কারুরূপী কেহ?
এ হাত ? কারুর বটে। কদম্ব দাড়িম্ব ?
কারুর। এ ক্ষীণ কটি ? তাহাও কারুর।"

(ব্যাধ, দশম সর্গ - কুরুক্ষেত্র)

সাধারণতঃ নবীনচন্দ্রের সব কাব্যেই একটি রোমান্টিক বিষাদ অনুভূত হয়, যে বিষাদ জীবনের এবং সমাজের আশাভঙ্গ ও ব্যর্থতাজনিত। প্রথমদিকে বায়রণের 'Hourse of Idleness -এর অনুসরণে লেখা অবকাশরঞ্জিনী (প্রথম খণ্ড - ১৮৭১, দ্বিতীয় খণ্ড) ১৮৭৮)র অনেকগুলি কবিতা - 'নিরাশপ্রণয়', 'বিষ-নিকষন' প্রভৃতি রোমান্টিক প্রেমের নৈরাশ্যবোধ থেকেই লেখা।

" আর কি হৃদেশ আসিবে আলয়ে,
আর কি পাবরে প্রাণেশে আমার ?
নিশিযোগে আহা ! ছিনু যে আশায়,
নিবিল সে আশা, হৃদয় আঁধার।"

(নিরাশপ্রণয়, অবকাশ রঞ্জিনী - প্রথম ভাগ)

'পলাশীর যুদ্ধ'(১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা'(১৮৮৭), 'রঙ্গমতী'(১৮৮০) নামে যে তিনটি ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য লিখেছিলেন নবীনচন্দ্র, তাতেও রয়েছে একধরণের রোমান্টিক উন্মাদনা ও আত্মভাবের প্রকাশ। মূল কথা, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের যুগ সার্থক ক্লাসিক আদর্শের

ছিল না। পাশ্চাত্য প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যেরও নবজন্ম ঘটেছিল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও নূতন মূল্যবোধ কবিদের স্বমত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়েছে আত্মসচেতনতা, সেখানে গীতিকবিতার বীজ ছিল নিহিত। প্রাচীনকাল থেকে নানাধর্মসম্প্রদায়ের সাধন ভজনে, বিভিন্ন ধরণের কাব্যে চলে আসছিল এই রীতি। ফলে সেযুগে বাংলা সাহিত্যে উদ্ভব হয়েছিল এক কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যরীতির। তখনকার প্রায় সমস্ত কবিই, একাব্য-কলাকৌশলে অল্পবিস্তর প্রভাবিত হন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে সুরেন্দ্র নাথ মজুমদারের (১৮৩৮-১৮৭৮) মহিলাকাব্য'র কথা। এটি তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত (প্রথম অংশ - ১৮৮০, এবং দ্বিতীয় সংস্করণে দুই অংশ একসঙ্গে ১৩০৩ সালে প্রকাশিত)। এতে নারীর জননী, জায়া, ভগিনী ও দুহিতা - এই চার রূপের যে বন্দনা আছে, সেখানে আবেগ ও মনন উভয়ই সমান মূল্য পেয়ে এক বিচিত্র গীতিকবিতার জন্ম হয়েছে।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) চারটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন 'চিত্তমুকুর'(১২৮৫), 'বাসন্তী'(১৮৮০) 'যোগেশ'(১৮৮১) ও 'চিন্তা'(১৮৮৭)-এর মধ্যে 'চিত্তমুকুর ও যোগেশ'(১৮৮১)-এর কয়েকটি কবিতায় মধুসূদন হেমচন্দ্রের রচনা-রীতির কিছু কিছু অনুকরণ থাকলেও তাঁর বেশীর ভাগ রচনায় রয়েছে রোমান্টিক প্রেমের বন্দনা এবং গীতিউচ্ছ্বাস।

এছাড়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০ - ১৮৯৮) একদিকে যেমন রোমান্টিক আখ্যানকাব্য, গাথাকাব্য রচনা করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি কয়েকটি গীতিকবিতাও লিখেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৬-১৯৩২) প্রথম দিকের রচনাতেও(গাথাকবিতায়) সেসময়কার কৃত্রিম ক্লাসিক পর্বের যুগোচিত নির্দেশ সুস্পষ্ট ছিল। পরিণত বয়সের কবিতা ও গানে রবীন্দ্র প্রভাবিত গীতিধর্মিতা ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ভাবানুভূতির প্রাধান্য থাকাসত্ত্বেও। এক কথায় কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যসংস্কার এবং আত্মমুখ রোমান্টিক গীতিপ্রবণতা - এই দুয়ের বিচিত্র আকর্ষণেই সে যুগের বাংলাকাব্যরীতির উদ্ভব হয়।

কিন্তু এই রীতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। এঁদের আত্মভাবমুখ ভাবনা অবলম্বনে এর পাশাপাশিই গড়ে উঠেছিল এক নূতন কাব্যরীতি, যার বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। এই কাব্যধারার প্রবর্তক হলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)। তিনি তৎকালীন নব্যশিক্ষিত কবিদের মতো যুদ্ধবর্ণনা-সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখলেন না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি - "তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।"[১] অর্থাৎ বিহারীলাল নিজের আনন্দে ধ্যান কল্পনার আবেশে সর্বদা নিছক ভাবের সাধনা করেছেন। উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যবোধ এবং বাস্তব হৃদয়বৃত্তি তার কবি-প্রকৃতিতে একই সঙ্গে চরিতার্থ হয়েছে, সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে জড়িত হয়েছে তাঁর অতৃপ্তির বেদনা। বিষয়ের চাইতে কবিহৃদয় গুরুত্ব পেয়েছে বেশী। আত্মকেন্দ্রিকতা, সৌন্দর্য-বিভোরতা এবং প্রকৃতিপ্রীতিই তাঁর কাব্যের প্রধান লক্ষণ। প্রথম রচনা 'সঙ্গীতশতক'(১৮৬২) অবশ্য এদিক থেকে ব্যতিক্রম। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী'তেই সর্বপ্রথম এই একান্ত অন্তর্মুখী ভাবনা-প্রকাশের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক গীতিকবিতা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বস্তুতঃ পক্ষে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের রচনায় গীতিকবিতার যে প্রচ্ছন্ন ভাবমূর্তি আমরা দেখেছি, বিহারীলাল তাতে নূতন বেগ সঞ্চার করলেন। বস্তু নয়, বস্তুর নির্যাসই যে গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষ্য তাঁর রচনাতেই সর্বপ্রথম তা বোঝা গেল। এর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যসাহিত্য।

বিহারীলালের অব্যবহিত পরে বাংলা কাব্যজগতে আসেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১ - ১৯৪১), এরাঁ শুরুতে হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলার উপহার'(১৮৭৫), 'প্রকৃতির খেদ'(১৮৭৫), দ্বিজেন্দ্রলালের আর্য্যগাথা প্রথম ভাগের(১৮৮২) 'আর্য্যবীণা' অংশ এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত দেশপ্রেমমূলক গান প্রভৃতি

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রচনা। তবু বিহারীলালের প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত হতে পারেননি। গীতিরস সিক্ত ইন্দ্রিয়াতীত পিপাসা, সৌন্দর্য-বিভোরতাই তাঁদের কবিসত্তা প্রকাশে প্রভূত সাহায্য করে। বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), 'সন্ধ্যাসংগীত'(১৮৮২) থেকে শুরু করে 'সোনারতরী'(১৮৯৪), 'চিত্রা'(১৮৯৬) পর্যন্ত রবীন্দ্রকল্পনায় বিহারীলালের ভাবকল্পনা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রেম, সৌন্দর্য-সন্ধান, জীবনদেবতা ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম সবই বিহারীলালের কাব্যে অংকুরিত হয়েছিল।

তাছাড়া 'চিত্রা'(১৮৯৬) কাব্যের দ্বিতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যলক্ষ্মীকে যে ধ্যানমন্ত্রে আরাধনা করেছেন সে মন্ত্র একান্তভাবে বিহারীলালের। আবার 'মানসী'(১৮৯০) থেকে 'চৈতালি' (১৮৯৬), 'কল্পনা'(১৯০০) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যদেবীর বন্দনা করেছেন, যা অস্পষ্ট, বাংলাকাব্যে সেই সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিহারীলালই। তবে বিহারীলাল যেমন আধ্যাত্মিক পর্যায়ের সৌন্দর্য-স্বরূপকে মানসীতে পরিণত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে সেই আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা দিয়ে গড়া অবাস্তব আদর্শসৌন্দর্য অবলম্বনে রোমান্টিক গীতিধর্মী উচ্ছ্বাসপূর্ণ আখ্যানকাব্য রচনা করলেও 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনাকাল থেকে ভিন্ন পথে পদার্পণ করেন। হৃদয় অরণ্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বিশ্বের সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলেন এসময় তিনি। সেজন্য পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) 'কড়ি ও কোমল'(১৮৮৬)-এ রবীন্দ্রনাথ জগতের প্রতি বিশ্বাস, মর্ত্যের প্রতি মমতাকে ফুটিয়ে তোলেন এবং 'মানসী'(১৮৯০)র যুগ থেকে জীবন ও সৌন্দর্য মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের এক নূতন কাব্যধারা গড়ে তোলেন। যদিও তখনও পর্যন্ত বাইরের জীবনকে অন্তর্জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেননি। তাঁর মনে সেসময় একটা সংশয় ছিল, 'সোনারতরী'তেই সেই সংশয়ের অবসান ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের মতো উদাসীন রোমান্টিক ছিলেন না। তাঁর চিন্তায় সর্বদা আনন্দ ও বিষাদ, মিলন ও বিরহ, তৃপ্তির উল্লাস ও অতৃপ্তির বেদনা, আলো ও

আঁধারের মতো পাশাপাশি বিরাজ করত। তাই তাঁর কাব্য আপাতোড়া নিছক ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভাব থেকে রূপে অনবরত যাওয়া আসার ভেতর দিয়ে তাঁর রোমান্টিক প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা, ব্যঞ্জনার আলো-ছায়া-লীলা, সূক্ষ্মসংবেদনশীল কল্পনা ও প্রগাঢ় অনুভূতির পথ বেয়ে অধ্যাত্মরসে বা অতীন্দ্রিয় ভাববিলাসে পরিণত হয়েছে। বিহারীলালের মতো তাঁর কাব্যলক্ষ্মী কেবল অন্তরমাঝে শুধু একা একাকিনী নন, জগতের মাঝেও বিচিত্ররূপিনী।

পাশ্চাত্য-সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরীজ-এর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত Lyrical Ballads (১৭৯৮)-এর প্রভাবে বিহারীলাল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে যে অন্তর্মুখী গীতিকবিতার সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই অসীম অনন্তের রসে পূর্ণ করে তুললেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মাঝে মাঝে নিজের হৃদয়ের বিমনস্কতাকে প্রকৃতি-চিত্রে ফুটিয়ে তুললেও বিহারী - কাব্যের ভাবব্যাকুলতার পরিচয় দেননি। প্রকৃতির রূপশোভাকে কেবল বিভিন্ন কবিতায় এঁকে গিয়েছেন মাত্র, রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতা বা রহস্যবোধের অবকাশও তিনি রাখেননি। রবীন্দ্রযুগের বাঙালী কবি হয়েও মানসিক স্বাতন্ত্র্য এবং কাব্য কলাবিধির অনন্যতায় তিনি ছিলেন আর একজগতের অধিবাসী এবং অত্যন্ত বাস্তব সচেতন।

অথচ সেসময় বাস্তব অবলম্বনে কাব্যরচনা করার প্রচলন ছিল না। বিহারীলালের সমাজচিন্তাবর্জিত আত্মকেন্দ্রিক সৌন্দর্যবাদই কাব্যে প্রাধান্য অর্জন করেছিল। যাঁরাই কাব্যরচনা করেছেন - অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮ - ১৯২৪), মানকুমারী বসু (১৮৬০ - ১৯৪৩), কামিনী রায়(১৮৬৪-১৯৩৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮ - ১৯২৬) প্রমুখ কবির লক্ষ্য ছিল দুদিকেই। একদিকে যেমন রয়েছে দ্বিজেন্দ্রকাব্যের স্পষ্টতা ও বাস্তব

চেতনার ছায়াপাত, অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্যবাদ, রসবিহ্বলতা, মুখ্য আত্মরতি, এবং কল্পনাভঙ্গির অনুসরণও অদৃশ্য নয়। রবীন্দ্র-প্রদর্শিত সরল কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত ছন্দের প্যাটার্ণ অনুসরণ করেই এঁরা বেশীর ভাগ কবিতা লেখেন।

অক্ষয়কুমার বড়াল বিহারীলালের কাব্যযন্ত্রটিকে অনুকরণ করেই কাব্যজগতে পদক্ষেপ করেন। তাঁর প্রথম দিকের 'ভুল'(১২৯৪), 'কনকাঞ্জলি'(১৯১২), 'প্রদীপ'(১২৯৩) প্রভৃতি কাব্যে বিহারীলালের মতো সংকল্প-সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ এবং তজ্জনিত আনন্দ ও নৈরাশ্যই উপলব্ধি করা যায় -

"জীবনের পূরিত সকল,
কে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকিসুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
সুপ্নে বাকি জাগাতে তরল।
কে যদি গো আসিত কেবল।

অযতনে খ'সে পড়ে সবি।
ধরিয়া তুলিটি শুধু, দুটি রেখা টেনে গেলে -
শূন্য হৃদি, হয়ে যায় ছবি।"

(অদৃষ্টবালা, ভুল)

গুরুর 'সারদা' মন্ত্রের অনুসরণ অবশ্য এতে নেই, নিজেরই হৃদয়ের কামনা ও তাঁরই চির অতৃপ্ত পিপাসার বিগ্রহরূপে এক মানসী প্রতিমা তাঁর কবিসুপ্তকে আচ্ছন্ন করেছিল। বিহারীলালের মতো তাঁর কাব্যলক্ষ্মী বহির্ভবিহারিণী নয়, বাস্তব অবাস্তবের মিলন-মন্ত্রের সাধন বিগ্রহ নয়, বাঙালীর সংসারে অধিষ্ঠাত্রী যে নারী, অক্ষয়কুমার তারই বন্দনা করেছেন। নিছক আত্মমুখী কল্পনা সত্ত্বেও বস্তুর বাস্তবতাকে তিনি কখনো কল্পনায় গ্রাস করেননি। বরং বাস্তব ও কল্পনার দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল অক্ষয়কুমারের রোমান্টিক কবিমন। বিহারীকাব্যের তৃপ্তি নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রেমের অধীর আকাংক্ষা ও পিপাসাই তাঁর কাব্যে বড়ো হয়ে উঠেছে, 'কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) কাব্যের 'প্রাণ' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে, পৃথিবীর

সৌন্দর্যকে, মানবজীবনকে একান্তভাবে আলিঙ্গন করে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিলেন -

" মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।"

('প্রাণ', কড়ি ও কোমল)

কিন্তু সেখানেও তৃপ্তি পেলেন না। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল -

" এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক অবসান
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।

('বন্দী', কড়ি ও কোমল)

আবার যখন চাইলেন রূপের একান্ত সম্ভোগে তৃপ্তি পেতে তখনও দেখলেন -

"বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।"

(নিষ্ফল প্রয়াস, মানসী)

সেজন্য এরপর কামনার স্তর অতিক্রম করে হৃদয়ের মিলন চাইলেন রবীন্দ্রনাথ (যখন প্রেয়সী রূপায়িত হয় মানসীতে) -

" দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।"

('সুরদাসের প্রার্থনা', মানসী)

তবুও তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে -

" সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?

('মানসসুন্দরী', সোনারতরী)

এই অতৃপ্তিই ধ্বনিত হয়েছে অক্ষয়কুমারের কাব্যে -

" সারা বসন্তটি ধরে অফুট গোলাপ তুলি,
বেছে বেছে ফেলে দেছি ছোট ছোট কাঁটাগুলি,
ছড়ায়ে রেখেছি পথে, এই পথ দিয়ে যাবে,
যেতে যেতে একবার মৃদু হেসে পাশে চাবে। "

('এই পথ দিয়ে যাবে,' বিবিধ : কবিতা ও গান')

কিংবা -

" আমার পিপাসা - আশা আমারি হৃদয়ে থাক।
এ যাতনা, এ কল্পনায় আমারি পরাণ যাক্।"

('বিরহ-সঙ্গীত' , [redacted] ৬ , বিবিধঃ কবিতা ও গান)

স্ত্রী বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমারের কবিজীবনে রূপান্তর ঘটে যায়। এতদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের যে অত্যুচ্চমানস-আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন, প্রকৃতির পরিশোধের মতো সেই অবাস্তব বিরহবেদনাই বাস্তব পত্নীশোকে রূপায়িত হয়ে গেছে। প্রথমদিকে কবি ও মানুষ, বাস্তব ও কল্পনার যে দ্বন্দ্ব ছিল, জীবনের এ পর্বে বাস্তবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে তা ঘুচে গেছে, মানুষ ও কবি এক হয়ে গিয়েছে। জীবনের সত্য কবিদৃষ্টির রশ্মিপাতে চিরন্তনের সৃষ্টি-শোভায় মন্ডিত হয়েছে। 'এষা' কাব্যের মর্মবাণী তাই ব্যক্তিগত কামনা -

" কি ছিলে আমার তুমি , - প্রেয়সী না ক্রীতদাসী ?
দুটী হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি।
একান্ত-আশ্রিত-প্রাণ-নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা-সব সাধ আমাতেই জাগরূক। "

("মৃত্যু", এষা)

অক্ষয়কুমারের এই বাস্তবপত্নীশোকের কাব্যের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যের সাধর্ম্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। উভয় কাব্যেরই কবির সুরে রয়েছে একটি বিষাদময় অনুভূতি।

প্রসঙ্গত: রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগের কাব্য 'স্মরণ'-এর কথা ভাবা যায় যেখানে কোনো প্রবল হৃদয়াবেগ বা উচ্ছ্বাস নেই, আছে এক শান্ত, সংযত বেদনার অনুদ্বেলিত রূপ।

" যতদিন কাছে ছিলে বলো কী উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে ?
ছিলে তুমি আপনার কর্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।
প্রতিদণ্ড মুহূর্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত হিয়া।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কী অজ্ঞাতবাস !
আজি যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার। "
('স্মরণ', ৭)

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'আলেখ্য' কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে মাতৃহারা শিশুর মর্মবেদনা। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'(১৯০৬) কাব্যগ্রন্থেও আছে অনুরূপ 'বিময়', খোকা ও মায়ের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে দাম্পত্যরস ও বাৎসল্যরস এক যুগ্ম-বেণীতে পরিণত হয়েছে এখানে -

"আয় বিধু, আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদ মুখে।
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো। "
('পূজার সাজ', শিশু)

তবে রবীন্দ্রনাথের এধরণের কবিতাতেও আমরা গৃহ-সংসারের অতিরিক্ত একটি নৈর্ব্যক্তিক রহস্যব্যঞ্জনারই আভাস পাই বেশী, যা দ্বিজেন্দ্র কবিতায় নেই। তাঁর কবিতায় ব্যক্তি-গত জীবনের ব্যথা, বেদনা ও বাৎসল্যরসের গভীর অনুভবই অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অক্ষয়কুমারের মতো পুত্রকন্যা ও গৃহপরিজনের পুংখানুপুংখ বর্ণনা তাঁর দাম্পত্যরসের কবিতায় দেখা যায় না, যা আছে গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতাতেও -

"মা-মরা দুখিনী মেয়ে, থাকে শুধু পথ চেয়ে
সে পথে চলিয়া গেছে জননী তাহার।
আসিতে চাহে না ঘরে, কাঁদিয়া পাগল করে,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার।"

('মা-মরা-মেয়ে', প্রেম ও ফুল)

উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রপ্রবর্তিত আদর্শ সৌন্দর্যের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম এই গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫ - ১৯১৮)। তিনি ছিলেন সহজ সরল ভাষার নির্ভীক পল্লীকবি - জনজীবনের শরিক, তাঁদের দুঃখবেদনা নিজের হৃদয়ের অন্তস্থলে অনুভব করতেন। তাঁর সমস্ত জীবন ছিল কঠিন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। সেজন্য বাস্তবজীবনকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবিভাবনা আবর্তিত হয়েছিল। ধূলিধূসরিত জীবনের বাইরে কোনো অতীন্দ্রিয় জগতের আকর্ষণ তাঁর চিত্তকে আকুল করেনি বা রূপাতীত রূপের সন্ধানে আত্মবিভোর হননি তিনি। মর্ত্যজীবনের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করেছিলেন। আত্মীয় পরিজন, সামাজিক উৎপীড়ন, সুগ্রাম, পত্নী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত সংসার ও সাংসারিক জীবনাশ্রয়ী দাম্পত্যপ্রেম (যে প্রেমের আদর্শ দেহসর্বস্ব) প্রভৃতি লৌকিক ও ঘর গৃহস্থালির চেতনাই তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় যে দুই বিপরীত সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে তীব্র বিজাতীয় বিদ্বেষ ব্যঙ্গকবিতার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই পদ্ধতির ও অনুসরণ করেন গোবিন্দদাস। তৎকালীন প্রজাদের ওপর রাজা ও রাজমন্ত্রীর অত্যাচারকে ব্যঙ্গ করে লেখা 'যুগের মুলুক' এর অন্যতম উদাহরণ। নিজের দুঃসহ অবস্থার করুণ চিত্র এঁকেও তিনি সেকালের সারস্বত সমাজের হৃদয়হীন আচরণের জন্য তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাত হানেন।

" ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে যষ্ঠ।
আজ যে আমি উপাস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট।
সেদিকেতে নাইক দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জ্জলা এ স্নেহবৃষ্টি
শিল পড়িছে পটপট্‌।"

('আমার চিতায় দিবে যষ্ঠ', গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা)

গোবিন্দদাসের সংবেদনশীল কবিমন স্বৈরাচারী সামন্ত প্রভুদের দ্বারা নারীর লাঞ্ছনা অবমাননাতেও উন্মাদ হয়ে উঠেছিল -

" কত যে জননী বোন্‌,
কাটিয়া ঘরের কোণ,
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময়!
কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা বড়, কিবা ক্ষুদ্র,
কি 'কৈবর্ত্ত মোসল্‌মান চণ্ডাল নিয়ে,
কি নাপিত কিবা ধোবা,
রসুনেল্লা ! তোবা ! তোবা !
কর্ম্মকার চর্ম্মকার কেহ বাদ নয়। "

('চন্দন', ৭, বাঙালী)

দ্বিজেন্দ্রকাব্যে এর অনুরূপ ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রচুর নিদর্শন মেলে। সুগভীর পত্নীপ্রেম ও দাম্পত্য-জীবনের সুখতপ্ত আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালকেও সহ্য করতে হয়েছিল বিভিন্ন সামাজিক

নির্যাতন এবং সেই অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর ব্যঙ্গকাব্যেও পরিস্ফুট করেছেন।

বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল ও গোবিন্দ দাস - উভয়ের কবিচিত্তে ছিল সামাজিক বহির্মুখী মন। কেউই রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নময় অবাস্তব সৌন্দর্যলোকের ধ্যানে বিভোর হননি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দিকের রচনায় সৌন্দর্যানুভূতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা অবাস্তব নয়, বাস্তব প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং বিবাহের পরবর্তী দাম্পত্যজীবনের সুধাস্নিগ্ধ ভাবানুভূতিই তাতে বিদ্যমান। 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেনী' নামে দুটি দাম্পত্যরসের কাব্য লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল সেগুলিও পত্নীপ্রেমের স্মরণে বেদনাবিধুর। গোবিন্দদাসেও রয়েছে অনুরূপ ব্যাপার। পত্নীবিয়োগের পর তিনিও শোককাব্য রচনা করে স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

তবে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। দাম্পত্যজীবনের গণ্ডীর বাইরেও প্রেমের যে আর একটি মুক্তস্তর এবং বিচিত্রতর রূপ ছিল তার প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। দাম্পত্যজীবনাশ্রয়ী প্রেম ও প্রেমের বিশ্বব্যাপক চিরন্তন-সত্তা দুইই প্রায় একই সঙ্গে তাঁর কবিজীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে গোবিন্দদাসের পত্নীবিয়োগের কাব্যে কোনো তত্ত্ব-কথা নেই, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনে পত্নীকে হারানোর পর শুধু বলতে পেরেছেন -

"জননী, ভগিনী, জায়া,
সকলের দয়ামায়া,
প্রেম-তিলোত্তমা ছিল সারদা আমার।
কি আর বলিব হায়,
আজি পিশাচের প্রায়,
অনল দিয়াছি সেই আননে তাহার।
কৃতঘ্ন আমার চেয়ে আছে কিহে আর ?"

('সারদাসুন্দরী', প্রেম ও ফুল')

দেবেন্দ্রনাথের (১৮৫৮ - ১৯২০) প্রেমের কাব্যও দাম্পত্য-রসপ্রধান। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো বাইরের কোনো তত্ত্ব তাঁর কবিপ্রাণের আশ্রয় হতে পারেনি। তিনি বিহারীলালের মতো ছিলেন

একান্তভাবে আত্মমুখী। কাব্যক্ষেত্রে সৌন্দর্যই প্রথম থেকে তাঁর হৃদয়ে আধিপত্য করেছে এবং সৌন্দর্যসাধনার সঙ্গে নিজের অন্তরের স্পর্শমণির স্পর্শে জগৎ ও জীবনের বাস্তব সৌন্দর্য অবাস্তব মনোহর হয়ে উঠেছে। বিহারীলালের ধ্যানমগ্নতা অবশ্য তাঁর ছিল না, ছিল কবি কীটস্-এর মতো একটি প্রবল রূপতৃষ্ণা ও তার আরতি। তাঁর কল্পনা ছিল বিষয়-আশ্রিত। অনুভূতি ছিল সাধারণভাবে প্রাথমিক স্তরের। দয়া, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি প্রাথমিক বোধগুলি অবিকৃত, অমিশ্র, সহজ ও চিরন্তনতার ভিত্তিতে তাঁর কাব্যে জয়ী হয়েছে। সূক্ষ্মতর উচ্চ ভাবতাৎপর্যে সেগুলিকে উৎরাবার চেষ্টা তাঁর কবিতায় খুব কম দেখা যায়।

তাঁর কবিদৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগ-উচ্ছ্বসিত। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর কল্পনা বর্ষা-ধকারে নিরুদ্দেশ অভিসারে যাত্রা করেনি, চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-তাপের ছায়া যেন দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনায় -

" আম্রের বাছনিদের সুহরিত দেহ
ভরি গেল রক্ত-পীতে, খসি গেল কেহ !
কঠিন উপলে বসি সারস - সারসী,
বিহগ-ভাষায় ডাকে - 'কোথায় সরসী' !
গহন অরণ্যে ছায়া পলায় তরাসে, -
ক্লান্ত পান্থ ভ্রান্ত হয়ে আতপে সন্ত্রাসে !"

('বৈশাখ', শেফালী-গুচ্ছ)

আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও দেবেন্দ্রনাথ কখনো গুরুতরভাবে মনোযোগী ছিলেন না, বাংলা কবিতাকে যেভাবে পেয়েছিলেন তার মধ্য দিয়েই তিনি পথ চলেছেন, নূতন কোনো উদ্ভাবনায় প্রকাশ রীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাননি। সমস্ত কবিতাই তিনি মিশ্রবৃত্ত পয়ার ছন্দে লিখেছেন। সনেট রচনাতেও তিনি মধুসূদন - প্রবর্তিত চতুর্দশমাত্রিক মিশ্রবৃত্তকে গ্রহণ করেছিলেন।

কাব্যের নামকরণেও দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রগামী এবং সমসাময়িক তিন কবিগুরুকে স্বীকার করেছেন। যেমন 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা'(১৯১৩), 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা'(১৯১২), মধুসূদনের অনুসারে, 'হরিমঙ্গল' (১৩১১ সাল, খ্রি-স ১৯১২), বিহারীলাল, আর 'অপূর্ব নৈবেদ্য'

(১৩১১ সাল, ১৯১২) রবীন্দ্রনাথের অনুসারে, যদিও মধুসূদন-হেমচন্দ্রের মতো স্বদেশ প্রেমের কবিতা তিনি লেখেননি। স্বদেশ বলে বাইরে একটা কিছু আছে এমন সজ্ঞান ধারণার পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। তিনি ছিলেন বিভোর, Emotional । ফলে মা ও সন্তানের মধুর সম্পর্ককে অবলম্বন করে বাঙালীর পরিবারভিত্তিক গার্হস্থ্যজীবনাগ্রহকে ফুটিয়ে তোলাতেই ছিল দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত আগ্রহ। একের পর এক কবিতায় গার্হস্থ্যজীবনের দৃশ্যভূমিকে তিনি রচনা করেছেন। অপূর্ব নৈবেদ্য(১৯১২)র 'মা' কবিতায় মায়ের প্রতি সন্তানের আবেগ কতটা আদর্শায়িত হতে পারে তা জানা যায়। আবার 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' (১৯১২)এর 'শিশুর স্তন্যপান'-এ শিশুর স্তন্যপানের দৃশ্য অংকন ও সেই দৃশ্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মূল অভিপ্রায় -

" ওই দেখ প্রজাপতি বসে আছে কুসুমে -
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া,
আত্মহারা, দিশেহারা,
চক্ষু বুজে, করবীর মুখ চুমে নিঝুমে। "

('শিশুর স্তন্যপান', অপূর্ব শিশুমঙ্গল)

'রাণীর জোড়হাত' কবিতায়ও দেখা যায় একঘরোয়া পারিবারিক জীবনে অশ্রু আনন্দে শিশু কতখানি ঘিরে থাকে? রবীন্দ্রনাথের শিশু-বিষয়ক কবিতার মতো শিশুর জগৎকে অসীম রহস্য ও মাধুর্যের অনুভূতিরেখায় অন্তরঙ্গ ও অনিবার্য করে তোলার ব্যাপারও এতে নেই।

গার্হস্থমনস্কতাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের কবিতার কেন্দ্রভূমি - যে গার্হস্থ্যভিত্তিক কাব্যের ধারাকে বাংলা সাহিত্যে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ও দ্বিজেন্দ্র সমসাময়িক মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু ও কামিনী রায় প্রমুখ।

গিরীন্দ্রমোহিনী (১৮৫৮-১৯২৪) প্রথমদিকে সমকালীন যুগোচিত আদর্শের দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'কবিতাহার'(১৮৭৩), এর বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গিতে

আছে সেসময়কার কবিদের অনুসরণ। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'ভারতকুসুম' (১৮৮২)- এই নামকরণ হেমচন্দ্রকেই স্মরণে নিয়ে আসে। কিন্তু এরপর যখন স্বামীর মৃত্যুর প্রচন্ড ব্যক্তিগত শোকের আঘাতে তাঁর হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়, তখন তিনি অন্তরের শোক বেদনা অবলম্বনে রচনা করলেন 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭, দ্বি-স ১২৯৮ সাল) নামে একটি কাব্য, এখানেই প্রথম তাঁর গার্হস্থ্যচিত্র অংকনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর 'আভাষ'(১২৯৭), 'শিখা'(১৩০৩), 'অর্ঘ্য'(১৩০৯), 'সিন্ধুগাথা'(১৩১৪) প্রভৃতি কাব্যও এই ধারাতেই পড়ে। রবীন্দ্রকাব্যের মৃত্যুকল্পনা, যার ভেতর দিয়ে নৈর্ব্যক্তিকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, গিরীন্দ্র-মোহিনীর এ পর্বের কাব্যে আমরা সেই মৃত্যুকল্পনার রূপকেই যেন দেখতে পাই। দ্বিজেন্দ্রলালের গার্হস্থচিত্রের কবিতায় এর আভাস মাত্র নেই। 'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয়ভাগে প্রথম প্রণয়ের যে স্বতঃস্ফূর্তমাধুর্য আছে 'মন্দ্র'(১৯০২) কাব্যের দাম্পত্যরস ও বাৎসল্যরসের কবিতায় প্রেমের সেই উল্লসিত রূপ অনেকটা সংযত ও সংহত।

দ্বিজেন্দ্রলালের অকৃত্রিম শোকপ্রকাশের কাব্যের সঙ্গে কামিনী রায়ের বিশেষ যোগ দেখা যায়। এইজন্যে যে,তাঁর কাব্যের সুর একান্তই ব্যক্তিগত,প্রথমদিকের কাব্যে যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই সুস্পষ্ট ।এসময়ের অধিকাংশ কবিতাতেই রয়েছে ঔদাসীন্য,প্রত্যাখ্যাত ও আশাহত নারীহৃদয়ের মৃদু অভিমান, অনুযোগ ও আত্মবিলোপের সুর। তা সত্ত্বেও কামিনী রায়ের সব কাব্যে আমরা একটি রোমান্টিক বিষাদই লক্ষ্য করি -

" নাই কিরে সুখ ? নাই কিরে সুখ ?
এ ধরা কি শুধুই বিষাদময় ?
যতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম হয় ? "

('সুখ', আলো ও ছায়া), অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' বইতে উদ্ধৃত, পৃ· ২৫০ ।

দ্বিজেন্দ্রলালের গার্হস্থ্যজীবন-চিত্রের কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ হল এই বিষাদের ছায়া।

মানকুমারী বসুর (১৮৬৩-১৯৪৩) 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'(১৮৯৩)র সঙ্গেও দ্বিজেন্দ্রলালের এ ধরনের কাব্যের যোগ আছে। মানকুমারী বসুর কাব্যটি পতিবিয়োগবিধুরার আর্ত ক্রন্দনে ভরা।

" একা আমি চিরদিন একা,
তবু সে দুদিন ছিল দেখা।"

('একা', কাব্যকুসুমাঞ্জলি) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-এর 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' বইতে উদ্ধৃত, পৃ.২৫১।

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) কবিতাতেও আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের এই গার্হস্থ্যচিত্রের আভাস পাই, তাঁর 'মা' কবিতা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা, মাতৃপ্রীতির একটি অপূর্ব ছবি আছে এ- কবিতায় -

"স্নেহবিহ্বল, করুণা ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে !
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, জননী লাগিরে।"

('মা', বাণী)

দ্বিজেন্দ্রলালের গার্হস্থ্যজীবনের কবিতায় মায়ের উপস্থিতি নেই। তাঁর স্বদেশীগানের সঙ্গেই রজনীকান্তের মিল বেশী চোখে পড়ে - উভয়ের দেশাত্মবোধক গানেই আছে বক্তৃতার সুর -

" আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান!
ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দু-নয়ান!
আজ, এক হ'য়ে সে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ বেদ-কোরাণ।"

('মিলন', বাণী)

" মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

('সংকল্প', বাণী)

রজনীকান্তের এ রচনার ছাঁচ নিরিক্যাল সুরে গীত না হয়েও গান। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আয় রে আয় ভিখারীর বেশে", "আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে", " একবার গানভরা মা ডাকে" প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গানও এ গুচ্ছেই পড়ে। কিন্তু রজনীকান্তের গানে যেমন স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীতে তেমন কোনো উদ্দেশ্যমূলকতা স্থান পায়নি - স্বদেশের মহিমা কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সভ্যতা অনুকরণের মোহে বিভ্রান্ত বাঙালীদের ব্যঙ্গ করা সত্ত্বেও। পাশ্চাত্যসভ্যতা তাঁর অপছন্দ নয়, তিনি চেয়েছিলেন দেশের মঙ্গলসাধন, তাই যারা এই সভ্যতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে বিকৃতরুচির পরিচয় দেন, নিজেদের অপমানবোধ হীনতা, বেশভূষা, আচার আচরণ সব ভুলে গিয়ে উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করেন। সেই সমাজ সংস্কারের আকাংক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই দেশের সবরকম অসারতাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

এ অধ্যায়ের প্রথমার্ধের আলোচনায় আমরা দেখেছি ঈশ্বরগুপ্তই প্রথম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিদেশী অনুকরণকে বিদ্রূপ করে লেখা তাঁর কিছু কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য -

" আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো,
ব্রতধর্ম কোর্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে! "

('দুর্ভিক্ষ', প্রথমগীত, বাউল চাঁদীসুর)

কিংবা -

" যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
....
....
বলে জো বাঙালি, ড্যাম, গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।

(তদেব)

এবং এই দেশপ্রেমের ঐতিহ্য বহন করেই এরপরে এ পথে এসেছিলেন রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রমুখ। 'বাঙ্গালীর মেয়ে', 'সাবাস হুজুক শহুরে', 'দেশভাইয়ের স্তব', 'নেভার নেভার' প্রভৃতি হেমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক রচনা ও মূলতঃ দেশাত্মবোধক রচনাই। ভারতবিদ্বেষী ইংরেজ এবং ইংরেজের আমদানীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি অনুরাগই প্রকাশ পেয়েছে এগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথেরও এ ধরণের কিছু হাস্যরসাত্মক রচনা আছে, যার ভেতরে প্রাধান্য পেয়েছে অন্তর্নিহিতও নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জনা। একটি আঘাত প্রবণতা থাকলেও তা স্পষ্ট নয়, গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ না করলে যথাযথ উপলব্ধি করা যায় না। তাছাড়া তাঁর দেশপ্রেম - বিশ্বমানবতার সাগরে পরিণতি লাভ করেছে। এই বিশ্বচেতনা দ্বিজেন্দ্ররচনায় প্রায় নেই বললেই চলে। বিশ্বময়ীর অস্তিত্বে তিনি করেছেন সন্দেহ, পরাধীনতার গ্লানি এবং আত্মধিককারই দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধকসঙ্গীতের মূল কথা। তাঁর মতো রবীন্দ্রনাথও গঠনমূলক কাজে সমালোচনাকে বিশেষ মূল্য দেননি, কিন্তু তাঁর কল্পনাও আশার আবেগে পরাধীনতার হীনতাবোধও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি যদিও হিন্দুমেলার যুগে খুব অল্প বয়স থেকেই জাতীয় সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি।

অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-পর্যালোচনাকালে আমরা দেখেছি নিজের জীবনে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা কিছু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্যে তাই প্রাধান্য পেয়েছে। সেজন্য সেকালের অন্যান্য কবিদের মতো কেবল দেশের অতীত গৌরব নিয়েই তিনি মত্ত হননি বাস্তবজীবনে দেশীয় লোকদের বিদেশী অনুকরণের মোহে বিভ্রান্ত হতে দেখে তাঁর অন্তরের গভীর ব্যথাও প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মনে শুধুই প্রশ্ন জাগে কেমন করে এ জাতি আবার মানুষ হবে? তাই তৎকালীন বাঙালী চরিত্রের নানা আতিশয্য - একদিকে প্রাচীন গোড়া হিন্দুধর্মাবলম্বী বাঙালী, এবং অন্যদিকে পরানুকরণের মোহে বিভ্রান্ত বাঙালী - এই উভয়কেই হাস্যরসাত্মক কবিতাও গানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন যাতে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে শুধরে নেয়। প্রসঙ্গত প্রমথ চৌধুরীর কথাই আমাদের মনে পড়ে। তিনিও জাতিকে জীবনের মর্ম্ম শেখাবার অভিপ্রায়ে হাতে নিয়েছিলেন ব্যঙ্গের চাবুক এমনকি কবিতা রচনার বিদ্রূপাত্মক উপদেশ দিয়েও তিনি বলেছিলেন -

" প্রিয় কবি হতে চাও লেখো ভালোবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন
তারি লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন -
জোর করা ভাব আর ধার করা ভাষা। "

('উপদেশ', সনেট পঞ্চাশৎ)

অবশ্য এই বিদ্রূপ স্পষ্ট নয়, অনাবৃত। তাঁর হাসির আড়ালে আছে একটি বুদ্ধিদীপ্ত মন ও মনন। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ এদিক থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম। সেখানে নেই প্রমথ চৌধুরীর Wit -এর চমৎকারিত্ব বা গুপ্তকবির হাস্যরসের মতো কথার মারপ্যাঁচ ও শব্দকৌশলের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। তাছাড়া ব্যঙ্গের তীব্র ও অমার্জিত রূঢ় আক্রমণ গুপ্তকবির হাস্যরসকে যেমন অনেক সময়ই পংকিল করে ফেলেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস তেমন নয়। তাঁর হাসি খোলাখুলি জোরালো এবং তা কেবল হাসাবার জন্যই নয়, দেশাত্মবোধ, কবির অন্তরের গভীর ব্যথা এবং আত্মধিক্কারই সেখানে নিবিড় হয়ে উঠেছে। কেননা হাস্যরসিকদের মতো তিনি দেশবাসীর দোষ ত্রুটিই কেবল চোখে আঙুল দিয়ে দেখাননি, যাদের নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুক

করেছেন নিজেকেও তাদের একজন করে নিয়েছেন। সেকালের পরাধীনতার জ্বালা এবং ক্ষোভ তাই তাঁর রচনায় যত বেশী প্রকট হয়েছে অন্যত্র তেমন হয়নি। তাঁর হাসির গানের "আমরা সেজেছি বিলাতি বাদর', "We are Reformed Hindus. " আমরা বিলাত ফের্ত্তা ক'ভাই" প্রভৃতি এই আত্মধিককার এবং সামগ্রিক দৃষ্টির অন্যতম উদাহরণ।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রচনাতেই এই বাস্তবানুভূতি এবং বক্তব্যের স্পষ্টতার দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। কখনো ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে ভাবকে প্রকাশ করেননি তিনি। ব্যক্তিগত জীবনের প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ, রোমান্টিক বিষাদ, অন্তর্মুখী গীতিচিত্ত ও তার সঙ্গে জাতীয়তার আদর্শ বহির্মুখী সামাজিক মনের বিচিত্র টানাপোড়ন তাঁর কবিমন গড়ে ওঠায় সাহায্য করেছিল। পূর্বসূরীদের মতো কোনো কাহিনী বা ঘটনা অবলম্বনে কবিহৃদয় এখানে উন্মোচিত হয়নি, বিশেষ কোনো বিষয় কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্র অন্তরের ভাব ব্যক্ত হয়েছে তবে তা বিহারীলালের মতো নিছক ভাববিলাস নয়। রবীন্দ্রকাব্যের অসীম অনন্তের আভাসও নেই এতে। আবার সমকালীন রবীন্দ্রানুরাগী কবিদের নৈর্ব্যক্তিক কবিদৃষ্টি বা বাস্তবের রূপান্তরও দ্বিজেন্দ্রকাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষতঃ 'আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি' এবং 'অপ্রাপণীয়ের জন্য হাহাকার' রোমান্টিক কবিতার এই লক্ষণও তাঁর রচনায় অনুক্ত থেকে গেছে। তবু যেহেতু কখনো প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলম্বনে, কখনো প্রেমানুভূতি, কখনো গার্হস্থ্য চিত্র, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো স্বদেশপ্রেম অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলালের সহজ সরল আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সেদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা পূর্ববর্তী ও সমকালীন কাব্য ধারায় অভিনব গীতিকবিতায় পর্যবসিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উল্লেখপঞ্জী

১. 'বাঙলাকাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব' : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৩৮১ : পৃ. ৭১ - তে উদ্ধৃত।

২. 'বিহারীলাল' : আধুনিক সাহিত্য : রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩শ খণ্ড) : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ - ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮ : পৃ. ১০১।